আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আল-ফিকহুল আকবারের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৪. ৩. ৩. খৃস্টানগণ

খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, ঈসা মাসীহ (আঃ)-এর সাথে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য আছে এবং তিনি অন্য সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। কাজেই তাঁকে ‘আব্দ’ অর্থাৎ দাস বা ‘বান্দা’ বলা উচিত নয়। কারণ তাঁকে ‘আব্দ’ বা ‘বান্দা’ বললে তাঁকে অন্য সকল সৃষ্টির সমান বানিয়ে দেওয়া হয়। এরূপ করা তাঁর মহান মর্যাদার সাথে বেয়াদবী। সর্বোপরি এতে আল্লাহর সাথে তাঁর যে বিশেষ নৈকট্যের সম্পর্ক রয়েছে তা প্রকাশে অবহেলা করা হয়।

এরপর তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাঁর বিশেষ নৈকট্য বুঝানোর জন্য তাঁকে ‘আল্লাহর পুত্র’ বলতে পছন্দ করেন। তাদের যুক্তি এই যে, পিতা তার পুত্রকে বিশেষভাবে দয়া করেন এবং নিজের চোখের সামনে তাকে প্রতিপালন করেন। আর সাধারণ দাস বা চাকরদের চেয়ে পুত্র অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়। এজন্য ‘পুত্র’ পদটিই তাঁর মর্যাদার সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।

এছাড়া তাদের কেউ কেউ তাঁকে ‘আল্লাহ’ বলতে শুরু করেন। তাদের যুক্তি এই যে, আল্লাহ ঈসা মাসীহের মধ্যে অবতরণ এবং অবস্থান করছেন। আর এজন্যই তো তিনি মৃতকে জীবিত করা, মাটি থেকে পাখি বানানো ইত্যাদি মানুষের অসাধ্য কাজ করতে সক্ষম হন। কাজেই তাঁর কথা-ই আল্লাহর কথা এবং তাঁকে ইবাদত করা অর্থ আল্লাহকে ইবাদত করা।

পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণের মধ্যে ঈসা (আঃ)-কে ‘আল্লাহর পুত্র’ বলার এ সকল দার্শনিক যুক্তি ও চিন্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতা বিরাজ করে। ফলে তারা ‘আল্লাহর পুত্রত্ব’ বলতে প্রকৃত পুত্রত্বই বুঝতে থাকে। কেউ মনে করতে থাকে যে, তিনি প্রকৃতই ‘আল্লাহ’। এজন্য আল্লাহ তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনে কখনো বলেছেন যে, তাঁর কোনো স্ত্রী নেই, কখনো বলেছেন যে, তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা।

এ তিন দলেরই মত প্রমাণের জন্য অনেক লম্বা চওড়া যুক্তি তর্কের বহর রয়েছে। কুরআনে শেষের দু দলের শিরকের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তি, বিভ্রান্তিকর দলিল-প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে খন্ডন করা হয়েছে।’’[1]

তিনি আরো বলেন: ‘‘শির্ক রোগে আক্রান্ত মানুষেরা বিভিন্ন প্রকারের। তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদা ভুলে গিয়েছে। সে কেবল শরীকগণেরই ইবাদত করে এবং কেবল তাদের কাছেই নিজের হাজত-প্রয়োজন পেশ করে। আল্লাহর কাছে সে নিজের প্রয়োজন জানায় না বা আল্লাহর দিকে সে দৃষ্টিপাতও করে না। যদিও সে নিশ্চিতভাবে জানে ও মানে যে, এ মহাবিশ্বের অনাদি-অনন্ত স্রষ্টা আল্লাহই। মুশরিকদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই নেতা, প্রভু এবং বিশ্বের পরিচালক। কিন্তু তিনি তাঁর ‘উলূহিয়্যাত’-এর কিছু মর্যাদা তাঁর কোনো কোনো বান্দাকে দিয়ে থাকেন এবং তাদের সুপারিশ কবুল করেন। তাদেরকে তিনি কিছু বিশেষ বিষয়ে পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। যেমন মহারাজ বা রাজাধিরাজ তার রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে ‘সামন্ত’ রাজা নিয়োগ করেন এবং তাকে উক্ত এলাকার পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। বৃহৎ বিষয়গুলো ছাড়া সাধারণ সকল

বিষয় পরিচালনা করার দায়িত্ব এ সকল ছোট রাজাদের উপর অর্পিত হয়। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী মুশরিক আল্লাহর এ সকল বিশেষ বান্দাদেরকে ‘আল্লাহর বান্দা’, ‘আল্লাহর দাস’ বা আল্লাহর আবদ’ বলতে দ্বিধাবোধ করে; কারণ এতে ‘এ সকল খাস বান্দাকে অন্য সব ‘আম’ বান্দার সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এজন্য সে এরূপ খাস বান্দাদেরকে আল্লাহর বান্দা না বলে ‘আল্লাহর পুত্র’ বা ‘আল্লাহর মাহবূব’ (আল্লাহর প্রিয়) বলে। আর নিজেকে সে এরূপ ‘খাস বান্দাদের’ বান্দা বলে নামকরণ করে। যেমন ‘আব্দুল মাসীহ’, আব্দুল উয্যা, ইত্যাদি। ইহূদী, খৃস্টান, সাধারণ মুশরিক এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দীনের অনুসারী সীমালঙ্ঘনকারী মুনাফিকদের অধিকাংশই এ রোগে আক্রান্ত।’’[2]

তিনি কুরআনের আলোকে ইহূদীদের বিভ্রান্তি আলোচনার পর বলেন: ‘‘পাঠক যদি ইহূদীদের এ সকল বিভ্রান্তির নমুনা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দেখতে চান তবে অসৎ আলিমগণ এবং পার্থিব স্বার্থের অনুসন্ধানকারীদের দিকে তাকান। পিতা-পিতামহদের অন্ধ অনুকরণ এদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়কর্ম। মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) সুন্নাত এরা ততটা গুরুত্ব দেয় না। আলিমগণ নিজস্ব পছন্দ, যুক্তিতর্ক, অকারণ বাড়াবাড়ি ও গভীরতার নামে যে সকল মত প্রকাশ করেছেন সেগুলোই তাদের দলিল, অথচ কুরআন ও সুন্নাতে এ সকল মতের কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না। এরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রমাণিত ও সহীহ বাণী বাদ দিয়ে জাল বা মাউযূ হাদীসের উপর নির্ভর করে এবং ভিত্তিহীন বাজে ব্যাখ্যা ও তাফসীরের পিছনে দৌঁড়ায়।’’[3]

তিনি কুরআনের আলোকে খৃস্টানদের বিভ্রান্তি আলোচনা করে বলেন: ‘‘আপনি যদি এ সকল বিভ্রান্ত পথভ্রষ্টদের নমুনা নিজ জাতির মধ্যে দেখতে চান তবে আপনার সমাজের ‘ওলী-আল্লাহ’দের সন্তানদের অনেকের দিকে তাকান। তাদের বিষয়ে এদের ধারণা ও আকীদা পর্যালোচনা করুন। তাহলে বুঝতে পারবেন যে, কোন্ পর্যায়ে এরা পৌঁছেছে। ‘আর অচিরেই জালিমগণ জানবে যে, তাদের কি পরিণতি হবে[4]।’’[5]

ফুটনোট

[1] শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৭৭-১৭৯।

[2] শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/১৮২-১৮৩।

[3] শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওযুল কাবীর, পৃ. ৩৪।

[4] সূরা (২৬) শু‘আরা: ২২৭ আয়াত।

[5] শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওযুল কাবীর, পৃ. ৩৬।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7116

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন